মার্গারেট মীড

বিজয় কুমার দত্ত

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

।। লেখকের নিবেদন ।।

প্রায় ২৫/২৬ বছর আগেকার কথা। আমেরিকান লাইব্রেরিতে একটি বই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বইটির নাম ঃ With a Daughter's Eye ঃ গ্রন্থকারের নাম মেরি ক্যাথারিন বেটসন। বইটি আদ্যোপান্ত পড়লাম। তার বিষয়বস্তু হল বিখ্যাত আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ মার্গারেট মীড ও তাঁর স্বামী ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী গ্রেগরি বেটসন -এর নাটকীয় মিলন-বিচ্ছেদের মর্মস্পর্শী স্মৃতিচারণ।

বইটির বিচিত্র ঘটনাবর্ত আমাকে আকর্ষণ করেছিল বলে, সে সম্পর্কে সেদিনের বিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রিকা ''প্রমা''র একটি সংখ্যায় (দ্বাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা) একটি আলোচনা লিখেছিলাম। সম্পাদক স্বয়ং আলোচনার ভূমিকায় লিখেছিলেন ঃ ''মুখ্যত স্মৃতিচারণ হলেও এই গ্রন্থটি দুটি বিজ্ঞানসাধকের জীবন, তাঁদের গবেষণা ও ব্যক্তিগত পারিবারিক - সামাজিক ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল।''

তারপর প্রায় দু' দশক অন্তে প্রসঙ্গক্রমে মার্গারেট মীড সম্পর্কে 'গ্রন্থতীর্থ' প্রকাশনার কর্ণধার শঙ্করীভূষণ নায়েককে জানিয়েছিলাম। তারপর সাহিত্যকর্মের নানা প্রসঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য সেই বিষয়টি আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম। এতকাল পরে শ্রদ্ধেয় শ্রী শঙ্করীভূষণ আমাকে অনুরোধ করেন, মার্গারেট মীড -এর জীবনী লেখার জন্য।

নৃতত্ত্ববিদ হিসাবে মার্গারেট মীড আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। কিন্তু সাধারণ-অসাধারণ প্রায় অধিকাংশ বাঙালি পাঠক নৃতত্ত্ব সম্পর্কে এবং এ বিষয়ে অসাধারণ গবেষক

মার্গারেট মীড সম্পর্কে খুব ওয়াকিবহাল নন। আমার বর্তমান বয়সের ভারে লিখনকর্মে আগেকার মতো পরিশ্রমী না হওয়ার কারণে, এই জীবনী রচনা আমার কাছে চ্যালেঞ্জতুল্য প্রয়াস বলে মনে করি। যাই হোক এই ভূমিকায় সাধারণভাবে নৃতত্ত্ব সম্পর্কে সামান্য আভাস ও মার্গারেট মীড সম্পর্কে কিছু তথ্য জানানো জরুরি।

একুশ শতকের মানুষের কাছে তত্ত্ববিশ্ব থেকে তথ্যবিশ্বের সম্প্রসারণ এত দ্রুত ও গতিময় যে, জিজ্ঞাসু ও উৎসাহী মানুষদের কাছে যে কোনো বিষয় প্রিয় প্রসঙ্গ হয়ে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। বিশেষ করে প্রযুক্তির নব নব উপস্থাপনায় আমাদের জীবন তথ্যের ভারে আজ মানুষ প্রবলভাবে ভারাক্রান্ত, এবং গণমাধ্যমের প্রচলিত ভাষ্যে, যে তথ্য না জানলে পিছিয়ে পড়তে হয়– বর্তমান লেখক সেই পিছিয়ে পড়া মানুষদের নগণ্য প্রতিনিধি হিসেবে, জিজ্ঞাসু মানুষদের জীবন ও তাদের বিচিত্র জীবনচর্যা সম্পর্কে বিনীত নিবেদন এই গ্রন্থের উপজীব্য।

নৃতত্ত্বের সাধনা এক দুঃসাহসিক অভিযান-প্রতিম। তার সাহায্যে এ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানী অন্য জগৎ আবিষ্কারের আগ্রহে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, সামগ্রিকভাবে প্রাকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আসলে নিজস্ব অভিজ্ঞতার বাইরের নানা ঘটনার ছবি। যে ঘটনা সাধারণভাবে প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবন বলে মনে করা হয়, তার বিপরীত জীবনচর্যা ও অভ্যস্ত আচরণ। নৃবিজ্ঞানীরা নানা দেশে ভ্রমণ করে, সে দেশের মানুষদের আচার আচরণ লক্ষ করেন তাঁদের গবেষণায়। প্রথম প্রজন্মের নৃতাত্ত্বিকদের কাছে প্রবল আগ্রহ ছিল নানা দেশের

মানুষদের ভ্রমণের বিচিত্র বিবরণ, যার সাহায্যে তাঁরা জানতে পারেন, সেসব দেশের বিচিত্র জীবনযাত্রা, বিশ্বাস, ধর্ম-আচরণ ও বিবিধ-বিধি-নিষেধের খবরাখবর। সুতরাং নৃতত্ত্বের উপজীব্য হয়ে ওঠে বিচিত্র শ্রেণির ভ্রমণ- কাহিনির সম্ভার, ইউরোপের নানা দেশেরও ভাষাভাষীদের বিবরণের সমাহার। বিশেষ করে পনের শতকের পর থেকে নতুন দেশের আবিষ্কারের কাহিনি তাঁদের বিশেষ উপাদান হয়ে গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে বিশ শতকে এই সমস্ত বইতে লেখা বিবরণ তাঁদের কাছে আর যথেষ্ট বলে মনে হল না।

তাঁরা স্থির করলেন, বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁরা নিজেরাই সেই অচেনা বা আধো -অচেনা দেশে যাত্রা করবেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাঁরা জানবেন অন্য দেশের জীবনযাত্রা, বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড—এমনকি সেখানে বেশ কিছুদিন থেকে শিখবেন সেখানকার ভাষা ও পারস্পরিক ভাববিনিময়ের ইতিবৃত্ত। তার ফলে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অবহিত হবেন, সে দেশের অধিবাসীদের সংস্কৃতি, বিশেষ করে তাঁদের ধর্ম-জন্ম-মৃত্যুর সংস্কার, এবং তাঁদের সঙ্গে একান্ত হয়ে থাকার কঠিন জীবন যাপন।

এখন 'সংস্কৃতি' শব্দটির সংজ্ঞা নানা শ্রেণির বিদগ্ধ মানুষদের কাছে এক এক রকম। বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কোনো মানবশিশুর যে অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে শৈশব থেকে, মা-বাবা-অভিভাবকদের নির্দেশে প্রচলিত শিক্ষাধারার আয়োজনে, এবং ধর্ম বা বিশ্বাসের পরিণতিতে এক কথায় একটি সামাজিক গোষ্ঠীতে মানুষ যে ভাবে বড় হয়ে ওঠে, তার ক্রমিক জীবনচর্যার ফলশ্রুতি হল সেই

গোষ্ঠীর বা সমাজবদ্ধ মানুষদের আচরণের ধারাবাহিকতার প্রকাশ, হল তার সংস্কৃতির পরিচয়।

এই সংস্কৃতি তথাকথিত উচ্চবিত্ত নাগরিকদের তথাকথিত 'সংস্কৃতি' নয়—যেখানে তাদের শ্রেণিভিত্তিক শিল্পচর্চার আয়োজন সাড়ম্বরে ঘোষিত। তার বদলে এই সংস্কৃতি হল নিতান্ত দৈনন্দিন সাধারণ জীবনযাত্রার পরিচয়। অর্থাৎ খেত-খামারে কাজের ধারা থেকে বাজারের কেনাকাটা, বিবাহ-উৎসব সব কিছুই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মোট কথা, সংস্কৃতির এই রূপ ব্যক্তিমানুষদের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার আমরণ ইতিবৃত্ত।

এই ধারণার প্রেক্ষিতে বলা যায় আধুনিক যুগের পর্যটন সংস্থার মাধ্যমে যে নির্দিষ্ট প্যাকেজ ভ্রমণে দেশ-বিদেশ-মহাদেশ সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা শুধু ভিন্নতর নয়—তা নিতান্ত অগভীর বা ভাসাভাসা, এবং তথাকথিত ভ্রমণকারীদের অভিজ্ঞতা, নৃতাত্ত্বিকদের কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। ভ্রমণকারী তথা ট্যুরিষ্টদের অভিজ্ঞতার বিবরণ ফটোগ্রাফের তাৎক্ষণিক বিবরণে সীমাবদ্ধ-এবং তা নৃতাত্ত্বিকদের আদৌ সহায়ক নয়।

এ প্রসঙ্গে ভ্রমণকারীদের লিখিত বিবরণে এক ধরণের বিপরীত মানসিকতার প্রকাশ ঘটে, অর্থাৎ নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে যা বেমানান, তাকে অস্বীকার করার প্রবণতা। প্রাচীন যুগেও গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস-এর বিবরণে তার প্রামাণ্য উদাহরণ স্পষ্ট : তিনি গ্রিস থেকে ইজিয়ান সমুদ্রপারে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে মিশরবাসীদের শোকপ্রকাশের চিহ্ন হিসাবে মাথা কামিয়ে ফেলার প্রথাকে বলেছেন বিপথগামী ও অস্বাভাবিক। সতের শতকে ব্রেজিল-এর উপকূলে ডি

ভ্রিস্‌-এর বিরাট ভ্রমণযাত্রার কাহিনিতে আমরা জানতে পারি সেখানকার বসবাসকারীদের বিচিত্র জীবনযাত্রার কাহিনি ঃ তারা অবশ্য ইতিহাস থেকে মুছে গেছে- রোগে, মড়কে এবং শ্বেতসভ্যতার দস্যুবৃত্তির ভয়ঙ্কর কাণ্ডকারখানায়।

বিভিন্ন স্থানের মানুষদের জীবনধারার এই ভিন্নতার প্রেক্ষিতে, মাত্র ২৪ বছর বয়সে মার্গারেট মীড-এর, একাকী প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে অবস্থিত সামোয়া দ্বীপে অভিজ্ঞতা অর্জন-এর কাহিনি সেই ১৯২৫ সালে শুধু রোমাঞ্চকর নয়-দুঃসাহসিকও বটে। এই গবেষণা কর্মের সময় বা তার কিছু আগে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ব্রনিস্লাউ ম্যালিনোস্কির গবেষণা —আদিম মানুষদের জীবনযাত্রা, যৌন সম্পর্ক, সন্তানের জন্ম এনং বৃটিশ নিউগিনি অঞ্চলের সংস্কৃতির বিববণ উল্লেখযোগ্য। যাঁরা নৃতত্ত্বের ব্যাপক ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসু, তাঁরা অবশ্যই ম্যালিনোস্কি লিখিত 'The Sexual Life of Savages in North Melanesia' গ্রন্থটির মাধ্যমে এ বিষয়ে আরো ঋদ্ধ হয়ে উঠবেন– এবং নৃতত্ত্বের বিষয়, মানুষের প্রাচীন জীবনযাপনের ব্যাপক বিবরণে উপলব্ধি করবেন, মানব সভ্যতার ইতিহাস অনেকখানি অস্পষ্ট আঁধারে ঢাকা। এ বিষয়ে. বিজ্ঞানীদের ধ্যান-ধারণা,পৃথিবীতে মানবজাতির ক্রমবিকাশ ও তার নানা ইতিবৃত্ত–আধুনিক মানুষদের প্রেম-হিংসা-সংঘর্ষ-হত্যা, যৌন অভ্যাসের বিচিত্র জটিলতার আভাস ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তাই এই প্রেক্ষিতে মার্গারেট মীড জীবিত কালেই আমেরিকান সভ্যতা ও সংস্কৃতির শুধু প্রতীক নয়, সুপারস্টার হয়ে উঠেছিলেন টিভিতে বিজ্ঞাপনে ও নানা আলোচনা

সভায়, এবং ১৯৭১ সালে তাঁকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হিসাবে প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর কিছু কিছু বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেও, দেশের সর্বত্র খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেনি।

একটি উল্লেখযোগ্য কারণ অবশ্য সমসাময়িক কালে মার্গারেট মীড-এর কৃতিত্ব খাটো করার প্রচেষ্টাঃ ইউরোপীয় নৃতাত্ত্বিকরা মার্গারেট মীড-এর গবেষণা ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, এবং সামোয়া দ্বীপ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার ঘোষণা, তাঁর মৃত্যুর পর আরো উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হয়েছিল।

আমাদের বিনীত ধারণা এই দ্বন্দ্ব সংঘাত-এর মৌল কারণ ছিল দুটি মহাদেশের সংস্কৃতির বিভিন্নতার কারণে। ইউরোপীয় মানসিকতায় এ ধারণা গুরুত্ব পায়নি যে, তারা অংশত তাদের জাতীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত; বরং তারা তাদের জাতীয় সংস্কৃতির জন্য গর্বিত। কিন্তু আমেরিকান সংস্কৃতিতে শ্রেণিভিত্তিক ধারণার যে প্রভাব, আমেরিকান সংস্কৃতিতে সেটি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবল প্রভাবের চিহ্ন পরবর্তীকালে Self-Help জাতীয় নানা গ্রন্থের প্রচার—যার আন্তর্জাতিক উদাহরণ ডেল কার্নেগী রচিত How to Win and Influence People জাতীয় গ্রন্থের বহুল প্রচার।

মার্গারেট মীড সম্পর্কে ইউরোপীয় নৃবিজ্ঞানীদের মনোভাব, এই দুটি মানসিক বিভিন্নতায় অন্বিত বলে, আমাদের বিনীত ধারণা।

বিজয় কুমার দত্ত

প্রথম অধ্যায়

মার্গারেট মীড এর জন্ম ১৯০১ সালে—অর্থাৎ বিশ শতকের শুরুতে, যে শতক অনেক ও অভাবিত পরিবর্তনের পটভূমি রচনা করেছে পৃথিবীর ইতিহাসে। তিনি জন্মেছিলেন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া অঞ্চলে। তাঁর শৈশবজীবন ছিল সর্বার্থেই বিচিত্র। তিনি এমন একটি পারিবারিক পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিলেন, যেটি তিনটি প্রজন্মের সমাহারে বিচিত্র ও স্বতন্ত্র।

তাঁর বাবা ও মায়ের পাঁচটি ছেলেমেয়েদের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে বড় সন্তান ঃ বাবা এডওয়ার্ড শেরউড মীড এবং মা এমিল ফগ মীড ছিলেন সমাজ-বিজ্ঞানী হিসাবে অনন্য। তাঁদের পরিচয় ঘটেছিল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের আবহে। তাঁদের জীবনের আদর্শ ছিল প্রথাগত শিক্ষা এবং সামাজিক নানা বিষয়ে অন্তরঙ্গ পরিবেশের মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের আর্তি। এই আদর্শ মার্গারেট মীডকে প্রভাবিত করেছিল পরবর্তী জীবনে।

মীড এর মা, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন অর্থনীতিতে, এবং কলেজে পড়ার সময়েই তিনি ছিলেন নারী ও পুরুষের অধিকারের মুখর প্রবক্তা। মীড - এর পিতামহী মার্থা অ্যাডালাইন র‍্যামসে মীড, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর, তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর সংসারে যুক্ত হন, মার্গারেট-এর জন্মের সময়,

এবং পুত্র ও পুত্রবধূর সংসারে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

সুতরাং এমন বিশিষ্ট ও ঋদ্ধ পরিবারে বড় হয়ে ওঠা মার্গারেট যে তাঁর চালচলনে ও জীবনচর্যায় অনন্য স্বাধীনচেতা নারী হিসাবে গড়ে উঠবেন সে কথা বলা বাহুল্য, এবং আধুনিক আমেরিকান সংস্কৃতির ভাবী প্রতিভূ হয়ে ওঠা তাঁর জীবনে অবধারিত ছিল।

খুব অল্প বয়সেই মীড -এর দক্ষতা ও মেধাবী মানসিকতায় বিস্মিত হন তাঁর পিতা। তিনি সে সময়ের নারী-পুরুষের কাজ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণায় আস্থা রেখে মনে করেছিলেন যে, তাঁর এই বড় মেয়েটিযদি ছেলে হত, তাহলে তিনি আরো সুখী ও স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন।

তাঁর পিতামহীও সে যুগের ধারণার বিপরীতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার ছিলেন। নিজে ছিলেন যথেষ্ট শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী ধারণায় আত্মস্থ। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মার্গারেট মীড শুধু ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে থেকে বাইরের জগৎ সম্পর্কে উৎসাহী ও যুক্ত থাকার কাজে প্ররোচিত হয়েছেন। মার্গারেট অবশ্য তাঁর বাবার চিন্তাধারায় আদৌ প্রভাবিত হননি- তাঁর শৈশবে বা কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে। মার্গরেট-এর জীবনে প্রথম শিক্ষিকা ছিলেন তাঁর পিতামহী, তি নি বিশ্বাস করতেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ঘরের মধ্যে বন্দী না থেকে বাইরের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে জীবন সম্পর্কে নতুন ও

অভিনব ঘটনার মুখোমুখি হয়ে তাদের চেতনা যাতে উন্নত হয়ে উঠতে পারে, এবং এ কাজে প্রত্যক্ষভাবে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষাদানের নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

এ সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মার্গারেট মীড শৈশবকালেই দিনলিপি লেখার অভ্যাসে মগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর ছুটির দিনগুলিতে। পরিবারের প্রথাগত শিক্ষার প্রগতিশীল পরিবেশ সত্ত্বেও, তাঁর প্রাথমিক স্কুলজীবন ছিল দু'বছরের কিণ্ডারগার্টেন-এ পাঠ, মাত্র দেড় বছরের জন্য Fourth grade তথা চতুর্থ মানের পড়াশোনা, এবং ছয় বছরের জন্য হাই স্কুল বা উচ্চতর বিদ্যালয়ে পড়াশোনা। কিন্তু স্কুলের শিক্ষায় প্রথাগত পাঠ না নেবার সময়, তাঁর পিতামহীর সতর্ক শিক্ষাদানের জন্য ফাঁকির সুযোগ ছিল না। তিনি তাঁর মেধা ও দক্ষতার কারণে বাড়ির ছেলেমেদের শেখাতেন নানা কারুকর্মের কাজ– যথা কাঠ ও ধাতুর খোদাই কর্ম, বাসকেট তৈরির কাজ, অঙ্কন শিক্ষা এবং সংগীত চর্চা ইত্যাদি, তাদের জীবনে বৈচিত্র্য এনেছিলেন।

এককথায় প্রকৃতির উদার পরিবেশে মানুষের জীবন যাতে বিচিত্র আস্বাদে ভরপুর হয়ে উঠতে পারে, তার শিক্ষায় তারা জীবনসংগ্রামে কৈশোরেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হওয়ার সাধণায় ব্রতী হয়ে ওঠে

আমরা মার্গারেট-এর পরবর্তী জীবন আলোচনায় দেখব শেষ জীবনে কিছুটা প্রথাগত জীবন দর্শনে আস্থা রাখলেও,

তিনি সারাজীবনই আমেরিকান সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার মুখর প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু তার মাতা ও পিতামহীর প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছাড়া তাঁর জীবন যথাযথ ভাবে গড়ে উঠতো কিনা সন্দেহ—কারণ এই দুটি নারীই তাঁদের বাইরের জীবনের কাজে, জীবিকার টানে ছিলেন পেশাদারী মানসিকতায় দক্ষ এবং একই সঙ্গে ঘরের কাজেও তাঁদের পটুতা মার্গারেট-এর বালিকা বয়সেও কৈশোর জীবনে উদাহরণ স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন

এ সম্পর্কে মার্গারেট-এর তারুণ্যে কিছু স্বতন্ত্র ভাবনা ছিল। তিনি নিজের তরুণ জীবন যাত্রায় স্থির সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন যে আধুনিকতার বিকাশে প্রথম প্রজন্মের নারীদের যা অবশ্য কর্তব্য ছিল। তিনি তার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখবেন না। তাঁর পূর্ববর্তী যুগের নারীরা বিয়ে করে দায়িত্ব নিয়ে ঘর-সংসার করছেন। সন্তানদের উন্নতির পথে সহায়ক হয়েছেন যাতে তারা নতুন সমাজের চেহারা-চরিত্র সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হতে পারে কিন্তু মার্গারেট তা হয়ে উঠবেন না তাঁর নিজস্ব সত্তায় তিনি বিশিষ্ট হয়ে উঠবেন, নতুন যুগের অভিনব চরিত্রের মানুষ—যা সেদিনের প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর আমেরিকান সংস্কৃতিতে সচল ও দ্রুতধাবমান জীবনচর্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই মনোভাব তথা জীবদর্শন সেদিনের প্রচলিত পারিবারিক ও বংশগত জীবনচর্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রতিম, যা আদৌ কোন পূর্বনির্দিষ্ট আদর্শে আদৌ আস্থা রাখতে স্পষ্টতই অনীহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার পটভূমি

মার্গারেট-এর পরিবার প্রায়ই তাঁদের বাসস্থান বদল করেছিলেন। তার ফলে তাঁর শিক্ষা একই সঙ্গে বাড়ির শিক্ষাধারায় এবং নানা শ্রেণির স্কুলের প্রথাগত পঠন-পাঠনে তার মনোভাব গড়ে ওঠে। সে যুগের প্রচলিত ধারণায় কোন ছেলে বা মেয়ের শিক্ষার ধরন ছিল একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যা সমসাময়িক পরিবার ও সমাজে নির্দিষ্ট প্রয়োজন ভিত্তিক—ছাত্র-ছাত্রীর মেধার ভিত্তিতে নয়। এ সম্পর্কে তাঁরা দুটি বাইরের শক্তি ও প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী চালিত ছিলেন—সমকালে গড়ে ওঠা মনোবিজ্ঞান ও যৌবনকালীন নানা বিশৃঙ্খল ও বিপরীত প্রবণতায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের টানাপোড়েনে তাঁদের পরিবার ও সন্তানের জীবনে অচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে।

১৯১৬ সালে মার্গারেট-এর মায়ের বোন ফ্যানি ম্যাকমাস্টার, পেনসিলভ্যানিয়াতে বেড়াতে এসে লক্ষ করেন তাঁর বোন-এর বড় মেয়ে মার্গারেটের পোশাক-ব্যবহারের অভিনবত্ব; তার স্কার্ট হাঁটুর কাছ অবধি তোলা, তার কিশোরী স্বভাবের মধ্যে বিদ্রোহের আঁচ স্পষ্ট। সে বছরের বসন্তকালে মার্গারেট পরিবার DoyLestown নামে এক জায়গায় চলে যান, সেখানে মার্গারেট Intelligeneer নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন—শৈশব ও বাল্যজীবনকে চিরবিদায়